بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৮ নভেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৮ নভেম্বর ২০১১-এর (১৮ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـــه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

গত খুতবায় আমি হাদীসের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, আহযাবের যুদ্ধে এমনও একদিন এসেছিল যখন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমনের ফলে পাঁচ বেলার নামায জমা করে পড়তে হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের আরবী ডেস্কের নঈম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি আমাকে পাঠিয়েছেন যা উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের বর্তমানে আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। তিনি (আ.) এ যুগের ইমাম, তিনি রেওয়ায়েত বা ঘটনা সম্পর্কে বলছেন, আমি স্বয়ং স্বপ্নে বা দিব্য-দর্শনে মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি অথবা তিনি (মসীহ্ মওউদ) স্বয়ং এর সত্যায়ন করেছেন তাই এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছি, হাদীসের কোন কোন গ্রন্থে তা উল্লিখিত আছে। কিন্তু মূল ঘটনা এ রকম নয় আর সকল হাদীসগ্রন্থ এ বিষয়ে একমতও নয়। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নয় বরং চার বেলার নামায একত্রে পড়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত হলো, আসর ও মাগরীবের নামায একত্রে পড়েছেন বা খুব সংকীর্ণ সময়ে তা পড়া হয়েতছে। এ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির খাতিরে আরো কয়েকটি হাদীস উথাপন করছি। অনেকের জানার আগ্রহও থাকে। চার বেলার নামায একত্রে পড়ার রেওয়ায়েত বা ঘটনা তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এ রকম, **'হযরত আবু ওবায়দাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, খন্দকের (আহযাবের যুদ্ধে) যুদ্ধে একদিন মুশরিকরা বা প্রতিমাপূজারীরা মহানবী (সা.)-কে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছিল; এমনকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রাতের একাংশ কেটে গেছে। এরপর মহানবী (সা.) হযরত বেলালকে আযান দিতে বললেন, তিনি আযান দিলেন। এরপর একামত দেয়া হলো আর মহানবী (সা.) আসরের নামায পড়ালেন, পুনরায় তকবীর দেয়া হলে মাগরীবের নামায পড়ালেন আর পরবর্তী একামত হলে ইশার নামায পড়ালেন'**। যেভাবে আমি বলেছি, এ হাদীসটি সূনান তিরমিযী গ্রন্থের নামায অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বায়হাকীও এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। ২০০৪ সালে সৌদি আরবের একটি প্রকাশনা সংস্থা মাকতাবাতুর রুশদ থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে হযরত আলী (রা.)-এর যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে আর তা এরকম, হযরত আলী (রা.) বলছেন, 'খন্দকের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা ওদের গৃহ এবং ওদের কবরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দিন। ওরা আমাদেরকে (সালাতুল উস্‌তা) অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায থেকে বঞ্চিত রেখেছে- এমন কি সূর্য অস্তমিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের এ ব্যাখ্যাই

করা হয় যে, সেটি আসরের নামায ছিল। যাহোক, আমি বলতে চেয়েছিলাম, নামায নষ্ট হওয়ায় হুযূর (সা.)-এর এত বেশি কষ্ট হয়েছিল যে, তিনি শত্রুদের অভিশম্পাত করেছিলেন। অতএব এখানে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় অর্থাৎ এক বেলার নামায নষ্ট হওয়াটাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল যার ফলে শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি এত শক্ত কথা বলেছেন।

এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, পরিখা (খননের) দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) অস্বিকারকারী কুরাইশদের ধিক্কার দেন। তিনি বলেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সূর্য অস্ত হতে যাচ্ছে, অথচ আমি এখন পর্যন্ত আসরের নামায পড়ারও সুযোগ পাই নি। মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমিও পড়তে পারিনি। এরপর আমরা বদ্‌হানের দিকে গেলাম, তিনি (সা.) নামাযের জন্য ওযু করেন আর আমরাও ওযু করি। তিনি (সা.) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের নামায পড়েন অতঃপর তিনি মাগরীবের নামায পড়েন'**।

বুখারী শরীফের তফসীর (ব্যাখ্যা) ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী লিখেন, ইবনে আরবী- এ বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর সেই নামায যা থেকে (তাঁকে) বিরত রাখা হয়েছিল সেটি কেবল এক বেলার নামায ছিল অর্থাৎ আসরের নামায। সে নামাযটি হয়ত সে সময় পড়া হয়েছিল যখন মাগরীব নামাযের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল বা সূর্য প্রায় অস্ত হতে যাচ্ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এখন পড়ে শুনাচ্ছি। একজন খ্রিস্টান পাদ্রী ফাতেহ মসীহ্ সাহেব মহানবী (সা.) সম্পর্কে অনেক আপত্তি করেছে আর অত্যন্ত নোংরা একটি পত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছে। তিনি (আ.) নূরুল কুরআন দ্বিতীয় খন্ডে সেটির উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া তাতে বিভিন্ন ধরনের আপত্তিরও খন্ডন করেছেন। তাতে একটি আপত্তি এরকম ছিল যে, একদিন মহানবী (সা.) চার বেলার নামায পড়েন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফাতেহ্ মসীহ্‌কে সম্বোধন করে তাতে যে উত্তর দিয়েছেন তা হচ্ছে,

'পরিখা খননের সময় চার বেলার নামায 'কাযা' করার বিষয়ে আপনার অর্থাৎ ফাতেহ্ মসীহ্ এই শয়তানী সন্দেহ সম্পর্কে **'প্রথম কথা হলো, আপনাদের জ্ঞানের বহর নিয়ে চিন্তা করুন। হে নির্বোধ! 'কাযা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কাযা' নামায আদায় করাকে বলা হয়, নামায ছেড়ে দেয়ার নাম কখনো 'কাযা' হয় না। যদি কারো নামায বাদ পড়ে বা রয়ে যায় তা হলে সেটির নাম হচ্ছে, 'ফওত' (নষ্ট হওয়া) হওয়া। এ জন্য আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী নির্বোধদের পাঁচ হাজার রূপী (পুরস্কারের) বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এমন নির্বোধও ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে যারা এখন পর্যন্ত 'কাযা' শব্দের অর্থও জানে না'**। সাধারণতঃ এ বিষয়ে আমাদের সমাজেও অনেকের সঠিক জ্ঞান নেই। তারা মনে করে, কাযার অর্থ হলো নামায বাদ দেয়া অথচ কাযার অর্থ হলো নামায নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর পড়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, **'শব্দকে যথাস্থানে ব্যবহার করতে জানে না এমন নিবোর্ধ সূক্ষ্ম বিষয়ের কি করে সমালোচনা লিখতে পারে আর গভীর বিষয়াদী সম্পর্কে কীভাবে আপত্তি করতে পারে? অবশিষ্ট থাকল পরিখা খননের সময় চার বেলার নামায একত্রে বা জমা করে পড়ার বিষয়টি! এমন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ সন্দেহের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্মে কাঠিন্য নেই,'** অর্থাৎ কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা কঠোরতার স্থান নেই। **'অর্থাৎ এমন কাঠিন্য নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়। এ জন্য তিনি প্রয়োজন ও বিপদাপদের সময় নামায 'জমা' করার এবং 'কসর' পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে চার বেলার নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই। অর্থাৎ চার ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই বরং সহীহ্ বুখারীর তফসীর 'ফাত্‌হুল বারী'তে লিখা আছে,'কেবল এক বেলার নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের জন্য সময় খুবই অল্প ছিল আর রীতি-বহির্ভূতভাবে সে সময় নামায পড়া হয়েছিল। আপনি যদি এখন আমার সামনে থাকতেন তবে আমরা আপনাকে বসিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতাম, চার বেলার নামায ছুটে যাওয়ার অর্থাৎ না পড়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েতটির কোন নির্ভরযোগ্যতা আছে কি? নামায বাদ গিয়েছিল অর্থাৎ আদায় করা হয়নি? শরিয়ত**

মোতাবেক চার বেলার নামায একত্রে পড়া যেতে পারে অর্থাৎ যোহর-আসর আর মাগরীব-ইশা। তবে, একটি দুর্বল হাদীসে আছে, যোহর ও আসর এবং মাগরীব ও ইশা একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে। কেবল এটিই প্রমাণ হয়, আসরের নামায সঙ্কীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল'।

অতএব, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই সিদ্ধান্তের পর, তাঁর মোহরাঙ্কনের পর এই চার বেলার নামায একত্রে পড়া সক্রান্ত যে হাদীস যা আছে তা ভুল। শুধু এক বেলার নামাযই বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এর জন্যও মহানবী (সা.) এতোটা মর্মযাতনায় ভুগেন যে, তিনি বিরোধীদের ভৎর্সনা করেন এবং বলেন, এরা আমাদের নামায নষ্ট করে দিয়েছে।

যাহোক, যে হাদীস গত খুতবায় আমি পড়েছি এর ফলে কিছুটা লাভও হয়েছে। আমাদের বই পুস্তকে যেখানে এর উল্লেখ আছে তাঁরও সংশোধন হয়ে যাবে। সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব-এর 'সীরাতুন নবী (সা.)' পুস্তকে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষ্য অনুসারে বিষয়টি সঠিকভাবেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি উইলিয়াম মুইর এর কথা লিখেছেন, যিনি চার ওয়াক্ত নামায জমা করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মিয়া সাহেব, অর্থাৎ মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সেখানে তার (মুইর এর) ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আসরের নামায সক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সিদ্ধান্ত যা বুখারী শরীফের হাদীস সহ অন্যান্য হাদীস থেকে পাওয়া যায় সেই অনুসারে এর ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ কেবল আসরের নামাযই অসময়ে পড়া হয়েছিল।

কিন্তু অন্যত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৩ মে, ১৯৮৬ সালে তাঁর এক খুতবায় পাঁচ বেলার নামায জমা পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল বা বুখারীর বরাতে তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাহের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে খুতবার যে সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বুখারী কিতাবুল্ মাগাযীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ সেখানে বুখারীর মাগাযী বা যুদ্ধ অধ্যায়ে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়নি। আমি নিজে সবসময় মূল হাদীস দেখার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু আমি যেহেতু এই হাদীসের রেফারেন্স এখানে দেখেছিলাম অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)'র এই খুতবায়; এজন্যই আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখিনি তাই ভুল হয়েছে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এই ভুলের কারণে লাভও হয়েছে। প্রথমতঃ জামাতের বই-পুস্তক যেখানেই ভুলভ্রান্তি রয়েছে তার সংশোধন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আমি নিজেও অনুধাবন করলাম, কোন সময় কোন উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে তা ভালোভাবে যাচাই করার চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয়তঃ আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্মরণ রাখা উচিত, যখন কোন প্রবন্ধ বা খুতবা প্রকাশ করা হয় প্রথমে দেখতে হবে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন কথা থাকলে তা অবশ্যই দেখা উচিৎ। অবশ্য, যুগ খলীফার কোন কথাকে অন্য কেউ সংশোধন করবে না বরং খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছেই তা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ। আবার পূর্ববর্তী খলীফার কোন কথা যদি বর্ণিত হয়ে থাকে আর সেসব কথা যদি কোন রেওয়ায়েত, হাদীস বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকে পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ী সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু খলীফায়ে ওয়াক্তকে জিজ্ঞাসার পর তা সংশোধন হবে। অতএব তাহের ফাউন্ডেশনকে ১৯৮৬ সালের এই খুতবার সংশোধন করা উচিত ছিল যেখানে পাঁচ বেলার নামায একত্রে পড়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে সংশোধন করুন। আমাকে লিখে পাঠাবেন এরপর তাদের দিক নির্দেশনা দেয়া হবে, তা কীভাবে করতে হবে এবং আগামীতেও একই নীতি অনুসৃত হবে। পূর্বের খলীফার বর্ণনায় যদি কোন ভুল উদ্ধৃতি স্থান পায় তাহলে পরবর্তী খলীফারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে তা ঠিক করাবেন। কিন্তু রেওয়ায়েত সন্দেহযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেখানে ভিন্ন হাদীস রয়েছে আর সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা আছে; যাচাই-বাছাই না করে তা ছাপিয়ে দেয়া ভ্রান্ত রীতি। এটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

যাহোক এই ব্যাখ্যা করা আমি আবশ্যকীয় মনে করেছি, যেভাবে আমি বলেছি এরফলে সবাই লাভবান হয়েছে। বাস্তব বিষয়টি সামনে এসে গেছে, সংশোধনী সামনে এসেছে আর কিছু প্রাসঙ্গিক কথাও এসে গেছে আর প্রশাসনিক দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়ে গেছে।

এরপরে আমি সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী কয়েকজন বুযূর্গের স্মৃতিচারণের বিষয়ে আসতে চাই যাঁদের মাঝে আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করবো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কন্যা সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসীর বেগম সাহেবার কথা, গত সপ্তাহে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি আমার খালাও ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাশাআল্লাহ্ সচল ও কর্মক্ষম ছিলেন। তিন চার দিন পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তী হয়েছিলেন। ডাক্তার নূরী সাহেব তাঁর চিকিৎসা করেছেন। একটি নালীর এনজিও প্লাস্টিও করা হয়েছে, দুই তিন দিন পর দ্বিতীয়বার রোগের আক্রমন হয় এরপর কিছুটা আরোগ্য লাভ করছিলেন তবে মনে হয় হঠাৎ করে হার্ট এটাক হয়েছে যা প্রাণহারী প্রমাণিত হয়। হাসপাতালেই চিকিৎসারত অবস্থায়ই আপন প্রভুর কাছে চলে গেছেন। মরহুমা সর্বদা হাসি-খুশী থাকতেন এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারিনী ছিলেন এবং যতটুকু সম্ভব অপরের খোঁজ-খবর রাখতেন। আর্থিক সাহায্যও করতেন আবার অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যারা তাঁকে চিনেন বা জানেন তাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে যেসব সমবেদনার পত্র আসছে তাতে মনে হয় প্রায় সবাই এই কথা লিখেছেন যে, তাঁর মত নিঃস্বার্থ, অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল মানুষ আমরা খুব কমই দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই মরহুমা খালার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর প্রিয়দের মাঝে তাঁকে স্থান দিন।

তিনি ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে হযরত সৈয়দা সারাহ্ বেগম সাহেবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি হরযত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মাতা যখন ইন্তেকাল করেন তখন সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসীর বেগম সাহেবার বয়স ছিল মাত্র সাড়ে তিন বছর। তাঁর শৈশবের আবেগ-অনুভূতির চিত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর এক প্রবন্ধে অঙ্কন করেছেন। এটি এমন চিত্র যা পড়ে মানুষ আবেগাপ্লুত না হয়ে পারে না। আমি নিজের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখি; এটি যখন আমি নির্জনে পড়ছিলাম তখন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হচ্ছিল। যাহোক, এর কিছু অংশ তুলে ধরব যা তাঁর শৈশবের উন্নত আচার আচরণের সাথে সম্পর্ক রাখে। এতেও সবার জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে।

যেভাবে আমি বলেছি, তাঁর বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর ছিলো যখন তাঁর মাতা পরলোকগমন করেন। কিন্তু এই বাল্যকালেও একটি উন্নত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি। আর সেই বিস্তারিত প্রবন্ধ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেছেন এর কিছু অংশ বা দু' একটি কথা আমি উল্লেখ করবো। সেই প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে মানুষের অবস্থা অদ্ভুত হয়ে যায় আর বর্ণনা যদি হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র তাহলেতো কথাই নেই। তারপরও যেভাবে আমি বলেছি, একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ উপস্থাপন করবো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে বিভিন্ন জন আমাকে যা লিখেছেন তা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বরং আমার আম্মা বলতেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তোমার খালাকে তাঁর আম্মার মৃত্যুর পর হযরত উম্মে নাসের (রা.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর এর উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) করেছেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সে সময় আমার আম্মাকে এ দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তাঁর দেখাশোনা করো। আমার আম্মা তাঁর থেকে প্রায় ১৯ বছরের বড় ছিলেন আর অনেকটা মা মেয়ের সম্পর্ক ছিলো।

আমার মা'য়ের যখন বিয়ে হয়েছে তখন আমার খালার বয়স সাত আট বছর বা খুব বেশী হলে নয় বছর হবে। যখন আমার মায়ের বিদায় হচ্ছিল তখন খালা এই বলে জিদ করছিলেন যে, 'বুবুজান ছাড়া আমি থাকতে পারবো না আমিও তাঁর সাথে যাবো'। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বুঝান আর এর ফলশ্রুতিতে তিনি শান্ত হন। তিনি শান্ত হয়েছেন আর সে ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আশৈশব যে ধৈর্য ও গাম্ভীর্যতা

দেখিয়ে এসেছেন তাঁরই বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আর অত্যন্ত উদাসী জীবনযাপন আরম্ভ করেন। যাহোক পরবর্তীতে তিনি হযরত আম্মাজান উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর কাছে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সন্তানদের জন্য রাবোয়ায় যেসব ঘর বানিয়েছেন, সেখানে খালা এবং আমার মায়ের ঘর পাশাপাশি ছিল— মাঝখানে শুধু দেয়াল ছিল। নকশা পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বর্ধিত নির্মাণ কাজ হয়নি। এক পর্যায়ে গিয়ে কিছু নতুন নির্মাণ কাজও হয় কিন্তু যতদিন ঘরের নকশা পরিবর্তন হয়নি আমাদের এবং তাঁর ঘরের মাঝে একটি দরজাও ছিল, পরস্পরের ঘরে যাতায়াত ছিল এবং অত্যন্ত অকৃত্রিম পরিবেশ ছিল। আমি আমার খালাকে সর্বদা হাসি-খুশি এবং হাস্যবদনে সাক্ষাত করতে এবং নিজ গৃহে ছোট বড় সকলকে স্বাগত জানাতে দেখেছি। তাঁর মাঝে আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য ছিল অতি উন্নত। ঘরে আগত ধনী-গরিব, ছোট-বড় এক কথায় সবার আতিথেয়তা করতেন। তাঁর স্বামী,আমার খালু মুকাররম পীর মঈনুদ্দীন সাহেব ছিলেন পীর আকবর আলী সাহেবের ছেলে। তাদের পরিবারের অধিকাংশই অ-আহমদী ছিল। খালা তাদের সাথেও আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন রক্ষা করেছেন। মুকাররম পীর মঈনুদ্দীন সাহেবের ভাতিজী লিখেছেন, আমাদের দাদাপক্ষের আত্মীয়রা অ-আহমদী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে চাচীর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ ও সম্মানের। তাদের সবাই চাচীকে গভীর মূল্যায়ন করেন এবং ভালবাসার সাথে স্মরণ করেন। আল্লাহ্ করুন ভালবাসার এই ব্যবহার তাদেরকে আহমদীয়তের নিকটে আনার কারণ হোক। তাঁর দোয়াও যেন তাদেরকে কাছে আনার কারণ হয় এবং তারা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চিনার সৌভাগ্য পায়।

ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাতিজা-ভাতিজীদের সাথে তাঁর অকৃত্রিম এবং ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সবাই তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কথা বলতো আর আন্তরিকতার কারণে তাঁর উপদেশও শুনতো আর তাঁর উপদেশ শুনে মন খারাপ করতো না। তাঁর বকাঝকাও হতো স্নেহের আবরণমন্ডিত এবং এবং হাস্যবদনে। তিনি নসীহত করতে হলে সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত আম্মাজান ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ঘটনাবলীর আলোকে সতর্ক করতেন ও উপদেশ দিতেন। তাঁর এক ভাগ্নী আমাকে বলেছে, একবার তাদের (দু'জন জ্ঞাতিবোন ছিল) পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত এমন একটি ভুল হয়ে যায় যার মাঝে কৌতুকের উপকরণও ছিল। বড় কাউকে এটি শোনানোর জন্য তারা ব্যাকুল ছিল। কিন্তু যেদিকেই চোখ যায় এমন লোকদের দেখে, যাদের শোনালে বকা শুনতে হতে পারে। অবশেষে তাঁর কাছে এলো। তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে তাদের কথা শুনলেন আর এতে এমন কৌতুক ছিল যার ফলে হাসিও পেল। তাদেরকে স্নেহের সাথে বকাও দিয়েছেন এবং বলেছেন, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষা হলো এই। আহমদীয়াত ও ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরার কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। যখনই বুঝানোর কোন সুযোগ পেতেন বুঝাতেন এভাবেই তিনি চেষ্টা করতেন আর তাঁর সব কথা একে ঘিরেই হতো। সেই সাথে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের মেয়েদের বুঝাতেন, তোমাদের নিজস্ব একটি বিশেষ পদমর্যাদা রয়েছে, তা রক্ষা করে চলতে হবে। আমি যখনই তাঁর ঘরে যেতাম খুব আদর-আপ্যায়ন করতেন, সেভাবে যেমনটি বড়দের করা হয়। খিলাফতের পর তাঁর ভালবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক আরো প্রগাঢ় হয়ে যায় আর এর সাথে আনুগত্য ও সম্মানের মাত্রাও যুক্ত হয়। দোয়ার জন্য নিয়মিত চিঠি দিতেন, খবর পাঠাতেন মোটকথা খিলাফতের সাথে তাঁর অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। এখানে দু'বার জলসায় যোগ দিয়েছেন, কোন একজন আহমদীর হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি যে সম্মান থাকা উচিত সে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁর মাঝে পরম পর্যায়ের ছিল। এতটা ছিল যে কখনও কখনও তাঁর ব্যবহারে আমি নিজেই লজ্জা পেতাম। তিনি যখনই আসতেন একথাই বলেতেন, প্রত্যেক বছর আসতে ইচ্ছে হয় কিন্তু বয়সের কারণে চিন্তায় পড়ি। কখনও কখনও প্রোগ্রাম করেও তা বাস্তবায়িত হয় না।

আমি যেভাবে বলেছি, হযরত আম্মাজান উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর কাছেই থাকতেন, আমার মায়ের বিয়ের পর বেশিরভাগ সময় তিনি হযরত আম্মাজানের কাছেই ছিলেন। হযরত আম্মাজানের অনেক ঘটনা তাঁর জানা ছিল। একবার যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণকালে সদর লাজনার ব্যবস্থাপনায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউ.কে.-র জন্য কিছু ঘটনা রেকর্ডও করিয়েছিলেন। হযরত আম্মাজানের সেই সমস্ত ঘটনাবলী যদি ছাপা না হয়ে থাকে

তাহলে তাঁর বরাতে তা ছাপানো উচিত। একবার যখন হযরত আম্মাজান খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর দু'জন স্ত্রীকে পালাক্রমে তাঁর ঘরে রাতের ডিউটিতে নিযুক্ত করেন। তখন আম্মাজান বললেন, আমার জন্য এ মেয়েটিই যথেষ্ট। তার সেবায় আমি অভ্যস্ত কাজেই অন্য কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। হযরত আম্মাজানও তাঁর সাথে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। যখন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল তখন হযরত আম্মাজান অত্যন্ত উদাস হয়ে যান। কিছুদিন পর যখন তিনি দেখা করতে আসেন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে হাত ধরে হযরত আম্মাজানের কাছে নিয়ে যান আর বলেন, এই নিন আপনার মেয়ে দেখা করতে এসেছে। মোটকথা, তাঁর সাথে আম্মাজানের অত্যন্ত স্নেহের ব্যবহার ছিল।

খিলাফত সম্পর্কে কথা বলছিলাম। খিলাফতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে এটিও বলে দিচ্ছি, খিলাফতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা এত গভীর ছিল যে, কোন নিকটাত্মীয়েরও পরওয়া করতেন না। এ কারণে তাঁকে কয়েকবার বিভিন্ন সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু খিলাফতের জন্য তিনি সর্বদা ঢাল স্বরূপ ছিলেন। তাঁর ঘরে লালিত-পালিত যুবক বরং বেশ বয়স্ক একব্যক্তি লিখেছেন, মোহতরমা (বিবি জানের) মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি কেননা আমরা একজন অত্যন্ত পুণ্যবতী, দোয়াকারীনি এবং বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। এরপর তিনি লিখেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেক, দোয়াকারীনি, গরীব ও অভাবীদের সাহায্যকারীনি এবং অত্যন্ত খোদাভীরু মহিলা। তিনি সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন এবং যুগ খলীফার নির্দেশাবলী পালনের সুযোগ সন্ধান করতেন।

তিনি মহল্লাতে লাজনার (মহিলা সংগঠনের কাজও করতেন)। একজন বলেন, প্রায় সময় লাজনার সদস্যাদের কাছে লাজনার 'মিসবাহ' পত্রিকার চাঁদা সংগ্রহের জন্য আমাকেও পাঠাতেন। যদি কোন বাড়ীতে বিলম্ব হয়ে যেতো বা চাঁদা না আসতো তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দিতেন। আর সবসময় চাঁদা জমা দেয়ার ব্যাপারে খুবই সোচ্চার থাকতেন।

এরপর লিখেন, কখনও কখনও বাজারে জিনিষ-পত্র কেনার জন্য পাঠাতেন। কোন সময় পয়সা অপর্যাপ্ত হলে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে খরচ করতাম; তিনি বলতেন, বিলম্ব না করে আমার কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে টাকা নিয়ে নিবে; আমি কারো কাছে ঋণী থাকতে চাই না। তেমনিভাবে এ বর্ণনাকারী আরো লিখেন, এরপর যে মাসে বিয়ের কার্ড বা নিমন্ত্রণ পত্র বেশি আসতো আমাকে বলতেন, (বর্ণনাকারীর নাম মুমতাজ) এসব কার্ডের একটি তালিকা তৈরি কর আর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তিনি বলেন, যে দিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের পুরনো কোন সেবিকার বিয়ে হতো সেদিন তিনি অবশ্যই যেতেন। অথবা বলতেন, এটি একটি গরীব মেয়ের বিয়ে আমাকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিবে। কখনও কখনও দিনে তিন বারও বলতেন, আমি এই গরীব মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই যাবো, প্রস্তুত থেকো। এছাড়া তাঁর আরো অনেক উপদেশ রয়েছে। তাঁর জামাতা, সৈয়দ কাশেম আহমদ লিখেছেন, যুগ খলীফার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক— খালা যে মহল্লায় লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সে মহল্লার মহিলাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এ সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন ছিলো না বরং একটি সহজাত প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যে দিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন সকালে বার বার বলছিলেন, হুযূর (আই.)-এর খিদমতে আমার জন্য দোয়ার আবেদন পাঠাও। মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে পূর্বেই তাঁর ধারণা জন্মেছিল, কেননা তাঁর এক দৌহিত্রকে তিনি নিজের মৃত এক ভাবীর সম্পর্কে বলছিলেন, তিনি এসেছেন। মেয়েদের ডেকে আদর করলেন এবং বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিও। অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারিনী ছিলেন। মা-শাশুড়ী ও স্ত্রী হিসেবে তাঁর দৃষ্টান্ত ছিলো অনেক উন্নত। তাঁর মরহুম স্বামীর রুচী বা পছন্দ-অপছন্দের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখতেন আর কখনো কোন অভিযোগের সুযোগ দেননি। এই প্রবীণ পুণ্যবানদের দৃষ্টান্ত এ জন্যই আমি উপস্থাপন করেছি যেন আমাদের নবদম্পতি, এমন পরিবার বা স্বামী-স্ত্রী যাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয় তারা যাতে; বিশেষভাবে মেয়েদের ভাবা উচিত, মহিলাদেরও এদিকে গভীর দৃষ্টি রাখা উচিৎ যে, নিজেদের ঘরের সুরক্ষা করা তাদেরই দায়িত্ব।

আবার লিখেন, তিনি স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন আর নিজের মেয়েদেরও এ শিক্ষাই দিয়েছেন, স্বামীদের প্রতি যত্নবান থাকবে। কখনো স্বামীর সাথে তাঁকে তর্ক করতে দেখিনি। কাউকে উপদেশ প্রদান করতে হলে বেশির ভাগই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আর হযরত আম্মাজানের বরাতে উপদেশ দিতেন। কোন সময় রাগ করলেও তা ক্ষণস্থায়ী হতো, আবার পূর্বের স্নেহসূলভ ব্যবহার অব্যাহত রাখতেন। আর মেয়েদেরকে অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের মেয়েদেরকে সবসময় উপদেশ দিতেন, স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের কারণে যেন কেউ হোঁচট না খায়। আল্লাহ্ করুন তাঁর এই দোয়া এবং এই উপদেশাবলী তাঁর মেয়ে এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের অন্যান্য মেয়েদেরও যেন কাজে লাগে।

তারপর লিখেন, চাকরানী বা সেবিকাদের সাথেও খুবই স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। যেসব মেয়েরা ঘরে বড় হত বা প্রাপ্তবয়স্কা হতো তাদের জন্য ছোট বয়স থেকেই অলংকারাদী বানানো আরম্ভ করতেন। তাদের বিবাহের খরচ ইত্যাদিও বহন করেন। কখনো কখনো দেখা গেছে, কাজের বুয়া এবং তাদের মেয়েরা খুবই খারাপ আচরণ করছে। কেউ তখনই তাদের বিদায় করে দেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন, এখনো এদের বিয়ে দেয়া বাকী আছে। বিবাহের পর তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হতেন। অধিকাংশ সময় বলতেন, বধুকে বুঝাতে হলে (সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই উপদেশও অনেক মূল্যবান) ছেলেকে বুঝাও আর যদি জামাতাকে বুঝাতে হয় তাহলে মেয়েকে সদুপদেশ প্রদান করা উচিত। অনুগ্রহ বা দয়াদাক্ষিণ্যের রীতি এমনভাবে অবলম্বন করতেন যেন অন্যরা বুঝতে না পারে। ইবাদত ও চাঁদার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নিজে চরম কষ্ট করে হলেও সে সকল দায়িত্ব পালন করতেন আর চেষ্টা করতেন যেন সে ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য প্রদর্শিত না হয়। ১৯৪৪ সালে যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পত্তি উৎসর্গ করার তাহরীক করেছিলেন তখন তিনি তাঁর সকল অলঙ্কার দিয়ে দেন। ১৩ বছর বয়সেই কাদিয়ানের দারুল মসীহ্তে ব্যবস্থাপিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কাদিয়ানের সেক্রেটারী নাসেরাতও ছিলেন। হিজরতের পরে রতনবাগ এবং রাবওয়ায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়েছে আর কখনো কোনো পদের জন্য লালায়িতা ছিলেন নাা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বও সামান্য কোন কাজের জন্য আহ্বান করা হলে তখনিই তা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। জ্ঞানগত, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী নারী ছিলেন। তিনি একটি স্বাক্ষাতকারে বলেন, লাহোরের রতনবাগে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের স্ত্রী, মামী হযরত সালেহা বেগম সাহেবা, রাতে ঘুরে বেড়াতেন এবং যাদের গায়ে দেয়ার মত কাপড় থাকতনা তাদেরকে তিনি কম্বল দিতেন।

এটিও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ১৯৪৯ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত আম্মাজানের সাথে তাদের গাড়িতে রাবওয়াহ্ আসার সৌভাগ্য হয়। তিনি বলতেন, এটি আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। রাবওয়ার মসজিদে মোবারকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে 'ইটে' দোয়াকারীদের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের মহিলাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যখন রাবওয়ায় প্রথম জনবসতি গড়ে ওঠে তখন সব বাড়িঘর ছিল কাঁচা। তিনি মহিলাদের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি উত্তর দারুস সদর হালকার লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিন সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার নায়েব সদর ছিলেন, সে সময় আমার মা ছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার সদর। তাঁর সাথে তিনি কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ৮২ সালে দু'এক বছর লাজনা ইমাইল্লাহ্র সেক্রেটারী খিদমতে খালক এবং সেক্রেটারী যিয়াফতের দায়িত্বও পালন করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন দায়িত্বে তিনি জামাতের সেবা করেছেন। আর বিভিন্ন সময় তাঁকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বা যে দায়িত্বেই ছিলেন তা তিনি পরম বিনয়ের সাথে পালন করতেন। তাঁর এক মেয়ে আমকে লিখেছেন, অসুস্থাবস্থায় কেউ যদি আম্মুর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন আর সাক্ষাতের সুযোগ না পেয়ে চলে যেতেন তাহলে তিনি খুবই মর্মাহত হতেন। আমাদেরকে বারবার বুঝাতেন, যদি কেউ সাক্ষাতের জন্য আসে তবে তাকে বাঁধা দেবে না। তাকে কখনো নিষেধ করো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকতো। প্রত্যেকেই তাঁর (রা.) সাথে সাক্ষাত করতে পারতেন।

কাজেই আমার পক্ষ থেকে কীভাবে নিষেধ থাকতে পারে? অতঃপর তাঁর অপর এক মেয়ে আমাকে লিখেন, আম্মু তাঁর সকল ভাই-বোনকে খুবই ভালবাসতেন। কেউ যদি ঠাট্টার ছলেও বলতো, অমুক আপনার সৎ বা আপন ভাই-বোন তবে তা তিনি তা সহ্য করতেন না। (হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল, কিন্তু সৎ বা আপনের প্রশ্ন উঠতো না)। জিজ্ঞেস করলে, তখনিই বলে দিতেন, সৎ বা আপনের প্রশ্ন ওঠানো ঠিক নয় কেননা, এ কথা আব্বাজান [অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)] খুবই অপছন্দ করতেন।

তিনি আরও লিখেন, আমাদের এক অ-আহমদী চাচা বলেন, ভাবী সবসময় গাম্ভীর্যের সাথে চলতেন। এরপর আমার মায়ের উল্লেখ করতঃ বলেন, খালা-আম্মুকে অনেক ভালবাসতেন এবং অধিকাংশ সময় বলতেন, আপা আমাকে লালন-পালন করেছেন। আব্বা কর্তৃক আমাকে বুবুজানের হাতে সোপর্দের পর বুবুজান তা শেষ পর্যন্ত পালন করেছেন। (আমার মাকে ছোট ভাই-বোনেরা বাজীজান বা বড় আপা বলে সম্বোধন করতেন)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর সুদীর্ঘ এক স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নে হযরত সাইয়্যেদাহ্ সারাহ্ বেগম সাহেবা এসেছেন। অন্যান্য কথার মাঝে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে বলেন, আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী বলেন, আমি স্বপ্নেই তাকে উত্তরে বললাম, তুমি আমাকে ছিরুর মত একটি মেয়ে দিয়েছ, আমি তোমার প্রতি কীভাবে রুষ্ট থাকতে পারি। (সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসিরকে ঘরে আদর করে ছিরু বলে ডাকা হতো)।

তিনি সর্বদা এ ব্যাপারে সচেতন থাকতেন যে, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কন্যা এবং তাঁর কারণে হুযূরের (রা.)-প্রতি কেউ যেন আঙ্গুল ওঠাতে না পারে। একটি ঘটনা যা তিনি কয়েকটি সভায়ও শুনিয়েছেন। একবার তিনি তাঁর ভাইয়ের ঘরে যাচ্ছিলেন, ঘরটি ছিল রাস্তার অপর পাড়ে আর তার ঘর রাস্তার এ পাড়ে। তিনি ভাবলেন, এদিকে আমার ঘর আর যেখানে যাবো অর্থাৎ ভাইয়ের ঘরও সামনেই তাই তিনি যথারীতি বোরকা বা নিকাব না পরে বোরকার নিচের অংশ মাথায় দিলেন এবং ঘোমটা দিয়ে হাটতে লাগলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন তিনি রাস্তায় এলেন তখন মাঝ পথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে আসতে দেখলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) "কাসরে খিলাফত" থেকে এ দিকে আসছিল। তিনি বলেন, আমার কোন উপায় ছিল না, আমি এভাবেই ঘরে ফিরলাম। আমার ধারণা হল, হুযুর আমাকে দেখেন নি। পরের দিন নাস্তার সময় আমি যখন হুযুরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, তুমি এক পা বাড়ালে লোকজন দশ পা বাড়াবে। কাজেই পর্দার ব্যাপারে যত্নবান হও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন তাঁর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বংশের অন্যান্য ছেলে মেয়ে এবং জামাতের ছেলেমেয়েরা যেন সর্বদা পর্দার প্রতি যত্নবান থাকে।

উল্লেখিত প্রবন্ধে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, 'তিন সাড়ে তিন বছরের আমাতুন্ নাসির সর্বদা মায়ের সাথে থাকার কারণে মায়ের প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিল। তার ভাইয়ের বুঝানোর পর সে নিরব হয়ে গেল। মৃত্যু কাকে বলে সে তা জানত না। অন্যদের মুখে মৃত্যুর কথা শুনে সে মৃত্যু কি, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করত। না জানি তার ভাই তাকে কি বুঝিয়েছে, সে না কাঁদলো, না হট্টোগোল করলো বরং সে নিরব হয়ে গেল। সারাহ্ বেগমের মরদেহ খাটিয়ায় (সবাধার) রাখা হলে সেখানে উপস্থিত জামাতের মহিলারা কাঁদতে লাগলো। তখন সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসির সাহেবা বলতে লাগলেন, আমার মা তো ঘুমিয়ে আছেন এরা কাঁদছে কেন? আমার মা যখন জেগে উঠবে তখন আমি তাকে বলবো, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন আর মহিলারা আপনার মাথার কাছে বসে কাঁদছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো লিখেন, তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি (রা.) সফরে ছিলেন। আমার সফরে থাকাকালীন সময়েই তাকে সমাহিত করা হয়। আমি সফর থেকে ফিরে এসে আমাতুন্ নাসিরকে আদর করলাম তখন সে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো কিন্তু সে কাঁদে নাই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম কিন্তু তাঁরপরও সে কাঁদে নাই। আমি মনে করলাম, মৃত্যু কাকে বলে এটা সে জানে না। কিন্তু এটি আমার ভুল ধারণা ছিল। আমার এই মেয়ে আমাকে অন্য একটি শিক্ষা দিচ্ছিল। সারাহ্ বেগম দারুল আনওয়ারে অবস্থিত নব নির্মিত

ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। যখন আমি দারুল মসীহ্‌তে ফিরে আসলাম তখন দেখলাম তার পায়ে জুতা নাই। এক ব্যক্তিকে জুতা আনতে বলা হলো। সে জুতা দেখানোর জন্য নিয়ে এলো তখন আমি আমাতুন্ নাসিরকে বললাম, তুমি পছন্দ করে নাও। যে জুতাটি তোমার পছন্দ হয় সেটিই নাও। সে দু'পা এগিয়ে থেমে গেল এবং এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে এবং একবার তার বড় মা উম্মে নাসেরের দিকে তাকালো। অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছে, আপনি যে আমাকে আমার পছন্দনীয় জুতা নিতে বলছেন, আমার মা তো মরে গেছে, আমাকে কে জুতা নিয়ে দিবে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এ দৃশ্য দেখে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। মনে হলো, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার চোখ থেকে অশ্রু বইতে শুরু করবে। আমি দ্রুততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নেই এবং এ বলে আমি সেখান থেকে চলে যাই, তোমার মায়ের কাছে জুতা নিয়ে যাও। খলীফাতুল মসীহ্ সানী লিখেন, আমাদের ঘরে সব বাচ্চারা নিজ নিজ মাকে উম্মি এবং আমার বড় স্ত্রী'কে আম্মিজান বলে সম্বোধন করে থাকে। আমি যাওয়ার সময় পিছন ফিরে দেখলাম আমাতুন্ নাসির নিজ আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে। সে অত্যন্ত ধৈর্যের থে জুতা উঠিয়ে তার মায়ের কাছে যাচ্ছিল। পরবর্তী ঘটনাক্রম সত্যায়ন করে যে, তার বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও সে তার মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর জন্য দোয়া করে লিখেন, **'আল্লাহ্ তা'লা এ অপ্রস্ফুটিত কলিকে (অর্থাৎ ছোট শিশুটিকে) ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন। তিনি এ ছোট্ট হৃদয়কে স্বীয় কৃপাবারি দ্বারা সিক্ত করুন এবং সুচিন্তা, মননশীলতা ও উত্তম আবেগানুভূতি দ্বারা ভূষিত করুন। এরফলে তিনি এক জগতের জন্য প্রাণদায়ী এবং সারা জগতের জন্য কল্যাণের কারণ সাব্যস্ত হোন। সর্বোত্তম দয়ালু খোদা যিনি হৃদয়সমূহ দেখে থাকেন, তিনি জানেন এ শিশুটি কীভাবে পরম ধৈর্যের সাথে নিজের আবেগ সম্বরণ করছে। (হে আল্লাহ্) জানিনা তোমার গুণাবলী সম্পর্কে সে জানে কি না, কিন্তু তোমার আদেশ পালনে সে তো আমাদের চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়েছে। হে প্রার্থনা শ্রবণকারী খোদা! আমি তোমার সামনে আকুতি করছি, তার হৃদয়কে শোকের ঝঞ্ঝাবায়ু থেকে সুরক্ষিত রাখ। সে বাহ্যিকভাবে যে পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তুমি অভ্যন্তরিণভাবেও তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান কর। সে যেভাবে চরম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে তুমি আক্ষরিক অর্থেও তাকে সে শক্তি দান কর। হে আমার প্রভু! তোমার প্রজ্ঞা তাকে এমন সময় তার মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, যখন সে সবেমাত্র মায়া-মমতা সম্পর্কে বুঝতে শিখছিল। হে প্রেম-ভালবাসার ঝরনা! তুমি তাকে তোমার ভালবাসার ক্রোড়ে আশ্রয় দাও এবং স্বীয় ভালবাসার বীজ তার হৃদয়ে বপন কর। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই তাকে নিজের জন্য উৎসর্গীত করে নাও। নিজের সেবার জন্য মনোনীত কর। সে যেন তোমারই প্রেমে বিভোর ও তোমার দুয়ারেরই ভিখারী হয় এবং সে যেন তোমার দুয়ারেই ধর্না দেয়। তুমি তাকে পার্থিব কল্যাণও দান কর যেন সে লোকদের দৃষ্টিতে নিগৃহীত না হয়। সে সমুদয় সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক যেন এমন থাকে যেভাবে কোন ব্যক্তি বৃষ্টির সময় এক ঘর থেকে আরেক ঘরে দৌঁড়ে যায় (অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত থাকে)।'**

মরহুমার যাপিত জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, আল্লাহ তা'লার কৃপায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর এ দোয়া অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তাঁর সন্তানরা, তাঁর পরিবারের সবাই এবং জামাতের প্রতিটি সদস্য যেন এ দোয়ার অংশীদার হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সব সন্তানদের জন্য আরোও একটি দোয়া করেছেন যা বর্ণনা করা আমি আবশ্যক মনে করি। আমি এটি পড়ে শুনাচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জামাতকেও এর ভাগী করুন। আমরা ইনশাআল্লাহ্ বিজয়ী বেশে পরবর্তী যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমাদের পক্ষেও যদি এ দোয়া গৃহীত হয় তবেই আমরা সফল হতে পারব। দোয়াটি হলো,

'হে আমার প্রভু! আমার বাকী সন্তানদেরও তোমার নিকট সমর্পণ করছি। এরা যেন দুনিয়ার কীট না হয়। এরা যেন তোমার জান্নাতের পাখি সদৃশ হয়। এরা যেন ধর্মের স্তম্ভ এবং বায়তুল্লাহ্‌র সংরক্ষক হয়। তারা যেন আকাশের নক্ষত্র হয়ে অন্ধকারে পথহারাদের পথ প্রদর্শন করে এবং উজ্জ্বল সূর্য সদৃশ হয় যা অন্ধকার বিদীর্ণ করে:

পরিশ্রম, উন্নতি ও কর্মময়তার পথ উন্মুক্ত করে। ঘুমন্তদের জাগ্রত করে এবং বিচ্ছিন্নদের একত্রিত করে। এরা যেন ভালবাসার সেই বৃক্ষ হয় যার ফল হিংসা-বিদ্বেষের তিক্ততা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এরা যেন ছায়াদার বৃক্ষ পরিবেষ্টিত সেই কূপের ন্যায় হয় যেখানে পরিচিত অপরিচিত সব ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম নেয় এবং যার শীতল পানি তৃষিতদের তৃষ্ণা নিবারণ করে ও যার ছায়ানীড় অসহায়দের আশ্রয় দেয়। এরা যেন অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে নিবৃত্তকারী আর নির্যাতিতদের বন্ধু হয়। স্বয়ং মৃত্যুকে বরণ করে পৃথিবীবাসীদের জীবনদায়ী হয়। নিজেরা কষ্ট করে অন্যদের সুখ প্রদানকারী হয়। তারা যেন খুব সাহসী, সচ্চরিত্রবান এবং এমন দানশীল হয় যার দস্তরখান সবার জন্য উন্মুক্ত হয়। তারা যেন পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং মিতব্যয়ী হয় ও অপচয়কারী হয়ে অন্যদের সামনে লজ্জিত না হয়। হে আমার পথপ্রদর্শক! তারা যেন ধর্মের প্রচারকারী হয়। ইসলাম বিস্তৃতকারী, হারানো গুণাবলী পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া তাক্বওয়ার পথসমূহ আলোকিতকারী, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বীরপুরুষ, لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ 'এর বাস্তবায়নকারী, পারস্য বংশীয়দের সুন্নত সংরক্ষণকারী হয়। হে আল্লাহ্! তারা যেন তোমার আত্মসম্মানের সংরক্ষণকারী, তোমার ধর্মের জন্য আত্মনিবেদিত, তোমার রসূলের জন্য উৎসর্গীত হয়। আর নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান এবং তাঁর (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] জন্য এদের উৎসর্গীত কর। হে আমার মালিক! তারা যেন তোমার, হ্যাঁ! শুধু তোমারই দাস হয়। জাগতিক বাদশাহ্দের সামনে তাদের মাথা যেন নত না হয়, কিন্তু তোমার দরবারে যেন তারা সর্বাধিক বিনয়ী হয়। তাদের সৎ ও পবিত্র বংশধর দান কর। তারা যেন জগদ্বাসীকে ঐশীজ্ঞানের পথে পরিচালিত করে, একটি চিরস্থায়ী পুণ্যের বীজ বপনকারী, পুণ্য সমূহকে আরো উন্নতকারী, মন্দলোকদের সংশোধনকারী, আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে ঘৃণাকারী এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়'।

'হে আমার চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী খোদা! তারা এবং তাদের সন্তানরা বংশ পরম্পরায় যেন পৃথিবীতে তোমার কাছে আমানত রূপে থাকে। শয়তান যেন তাদের ক্ষতি করতে না পারে। তারা যেন তোমার এমন সম্পদে পরিণত হয় যাকে কেউ চুরি করতে না পারে। তারা যেন তোমার ধর্মের প্রাসাদের জন্য কোনার পাথর হয় যাকে কোন রাজমিস্ত্রী উপেক্ষা করতে না পারে। তারা যেন তোমার উদ্যত তরবারিসমূহের একটি তরবারি হয় যা অনিষ্টের সব মূল কর্তন করে দেয়। তারা যেন তোমার মার্জনার প্রতিচ্ছবি হয়। তারা যেন বিপদ মুক্তির সুসংবাদ দাতা হয়। হ্যাঁ, হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী খোদা ! তারা যেন তোমার সেই শিঙ্গা হয় যা তুমি তোমার পথহারা বান্দাদের একত্রিত করার জন্য বাজিয়ে থাক। মোটকথা, তারা যেন তোমার হয় এবং তুমি তাদের হও। এমনকি তাদের প্রত্যেকে যেন এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখে বলে উঠে,

আমি তুমি, তুমি আমি
আমি দেহ তুমি প্রাণ
কোন ব্যক্তি যেন এটা বলতে না পারে
আমি ও তুমি ভিন্ন সত্তার অধিকারী।

আমীন সুম্মা আমীন ওয়া বেরাহমাতিকা আসতাগীস ইয়া রাব্বাল আলামীন'।

আল্লাহ্ করুন এ দোয়া যেন জামাতের সকল সদস্যের পক্ষে পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করতে থাকুন এবং তাঁর সন্তানদের তাঁর উপদেশ সমূহ পালনের সৌভাগ্য দিন।

দ্বিতীয় জন হচ্ছেন আমাদের জামাতের বুযূর্গ মুকাররম মওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আহমদ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্, পিতা-মরহুম মুকাররম মওলানা আব্দুর রহমান সাহেব। আব্দুল ওয়াহ্হাব আহমদ শাহেদ সাহেব ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে প্রায় দেড় মাস গুরুতর অসুস্থ থাকার পর মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহেদ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ তারিখে আযাদ কাশ্মীরের কোটলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই শিক্ষার্জন করেন। ১৯৬৭ সালে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তানের দশটি স্থানে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এরপর ১৯৯১ সাল থেকে

১৯৯৯ সাল পর্যন্ত নাযারাত দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র অধীনে বিভিন্ন জেলাতে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বাইরে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তাঞ্জানিয়াতে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর পুনরায় তাঞ্জানিয়াতেই জুলাই ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মুরব্বী হিসেবে দারুয্ যিয়াফত রাবওয়াতে সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তিনি খুবই প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী, মিশুক ও হাস্যবদনের মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। অতিথি পরায়ণ ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সর্বজন প্রিয় মানুষ ছিলেন। জ্ঞান পিপাশু ছিলেন। আল্ ফযল ও অন্যান্য পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লিখতেন। চারটি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনাকারীদের পরিবার, যারা ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রেখেছিলেন— তাদের গদ্দীনশীন ছিলেন। তাদের মধ্য থেকেই হযরত মওলানা মাহবুব আলম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লী থেকে হিজরত করে গুজরাতের 'চাক মিয়ানা টিল্লোতে' বসবাস শুরু করেন। অতঃপর এখান থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশে কাশ্মীর যান।

তিনি 'গুই' অঞ্চলে থাকা অবস্থায় ইমাম মাহদী (আ.)-এর অবির্ভাবের কথা জানতে পারেন। তিনি প্রায়শঃই বলতেন, এখন একজন ঐশী সংশোধনকারী ব্যক্তির আগমনের সময়। ইমাম মাহদীর এসে যাওয়ারই কথা। এ ধারণায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয়ে গেছে। অতএব তিনি খোঁজ-খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং নিজ শিক্ষক হযরত মওলানা বুরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমীর সাথে সাক্ষাত করেন আর নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। আপনিও নিদর্শনাবলী অনুযায়ী যাচাই করুন। সেই সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে অবস্থান করছিলেন। তিনি লাহোরে পৌঁছান এবং সরাসরি তাঁর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আত করে ফিরে আসার পর তাঁর চরম বিরোধিতা হয় তদুপুরি অনেক পুণ্য স্বভাবের মানুষ তাঁর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেন।

তৃতীয় জন হচ্ছেন, মুকাররম আব্দুল কাদের ফাইয়ায সাহেব চান্ডিও, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। তাঁর পিতা হলেন মুকাররম মাস্টার মরহুম গোলাম মোহাম্মদ সাহেব চান্ডিও। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম সন্তানদের স্কুলে ছেড়ে আসার জন্য যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে তিনি হার্ট এট্যাকে আক্রান্ত হন। তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছানো হয় কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর অনুযায়ী তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১লা মে ১৯৭৪ইং তারিখে তিনি 'শাহেদ' ডিগ্রি লাভ করে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। তিনি পাকিস্তানে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগে এবং ওয়াকফে জাদীদ এর অধীনে চৌদ্দটি স্থানে ধর্মের সেবা করার সুযোগ পান। দেশের বাইরে তাঞ্জানিয়ায় দু'বার সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি 'নগর পারকারের' মিটঠিতে নায়েব নাযেম ওয়াকফে জাদীদ হিসাবে সেবা করার সুযোগ পান। মৃত্যুকালে করাচীতে কর্মরত ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত ভাল মনের অধিকারী, নেক স্বভাব বিশিষ্ট, হাস্যবদন এবং সচ্চরিত্রবান মানুষ ছিলেন। যে জামাতেই যেতেন সেখানকার সবাইকে আপন করে নিতেন। অতিথি সেবক, গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও গুণগ্রাহী বান্দা ছিলেন। তাঁর ভেতর সহ্য করার দারুণ ক্ষমতা ছিল। কেউ কষ্ট দিলে তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন এবং কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক ছিল। যুগ খলিফার প্রতিটি নির্দেশের সামনে নতজানু থাকতেন। নিজে পরিপূর্ণরুপে আনুগত্য করতেন এবং জামাতের সাবাইকে তা মেনে চলার জন্য উপদেশ দিতেন। মরহুমের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতের সংখ্যা অনেক। নিজ গন্ডীতে সকলের প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন। যেসব জামাতে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন আজও সেখানে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। তিনি সিন্ধু প্রদেশের প্রখ্যাত

চান্ডিও গোত্রের প্রথম ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন এবং সিন্ধু প্রদেশের মুরুব্বীদের মাঝে তিনি ছিলেন তৃতীয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন।

চতুর্থ জন হলেন করাচীর মুকাররম মুনীর আহমদ খাঁন সাহেব। তার পিতা হলেন মুকাররম আব্দুল করীম খাঁন সাহেব। তিনি গত ৭ই নভেম্বর ২০১১ই তারিখে ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

তিনি হযরত হাকীম মৌলবী আনোয়ার হোসাইন খাঁন সাহেবের পৌত্র এবং হযরত আব্দুল রহীম নাইয়ার সাহেবের নাতী এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী মুকাররম ইয়াহিয়া খাঁন সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী ও যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য পেয়েছে। রাবওয়াতে প্রথম রুটির প্লান্ট স্থাপনের সময় তিনি বিশেষভাবে সেবা করার সুযোগ পান। তিনি ইংল্যান্ডের জলসা সালানার অনুবাদ বিভাগ ও কমিনিউকেশন ব্যবস্থাপনায়ও কাজ করার সুযোগ পান। তিনি নূহ (আ.)-এর নৌকার ব্যাপারে গবেষণা করেন এবং এ ব্যাপারে কুরআন, বাইবেল ও পুরাতন যুগের পুস্তক সমূহের আলোকে একটি পুস্তক প্রণয়নের সৌভাগ্য লাভ করেন, যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। নূহ (আ.) এর নৌকা সংক্রান্ত তাঁর এ গবেষণার কথা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর নিজের দরসে কুরআন এবং বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বেও উল্লেখ করেছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং খোলা মনে অন্যদের সাহায্য করতেন এবং তিনি মূসী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মামাতো বোন। অর্থাৎ ইনি হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের জামাতা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সাথে ক্ষমাসূলভ ব্যবহার করুন। আমি যাদের উল্লেখ করেছি, নামাযের পর সকল মরহুমের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)